বাংলা থিয়েটারের বিবর্তন ও দর্শক

মেঘনাদ ভট্টাচার্য

বাংলা থিয়েটার বা বাঙালীর থিয়েটার - মধ্যবিত্তদের থিয়েটার একথা বললে সত্যের অপলাপ হয় না। বাংলা থিয়েটার মূলত মধ্যত্তি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষজন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। থিয়েটার করেন মধ্যবিত্তরা - দেখেনও তাঁরা। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় কিংবা খেটে খাওয়া মানুষজন শ্রমিক অথবা কৃষক এঁদের সঙ্গে থিয়েটারের যোগাযোগ কম। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য অন্যান্য মাধ্যম আছে। যেমন শ্রমিক - কৃষকদের জন্য যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান এবং বর্ত্তমানে হিন্দি সিনেমা তেমনই উচ্চবিত্তেরও ক্লাব ত্যিাদি নানাবিধ মনোরঞ্জনের উপায় আছে।

তাই একদম শুরুর দিকটা ছাড়া - ১৮৭২ সন থেকে অর্থাৎ যখন সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন থেকে বাংলা থিয়েটারে মধ্যবিত্ত দর্শকদের মানসিকতা, চাওয়া-পাওয়া রাজনৈতিক-সামাজিক বোধ ইত্যাদি সর্বাধিক প্রতিফলিত হচ্ছে। থিয়েটারে একসময় যেমন হিন্দু জাগরণের প্রতিফলন ঘটেছে, স্বদেশী আন্দোলন, ভারতছাড়ো, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে তেমনই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগেরও প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে সময় সময় বাংলা থিয়েটার তার মোড় বদল করেছে – দিক বদল করেছে -তবে থেকে গেছে এতদিন। কখনও স্তিমিত হয়েছে, কখনও উদ্বেলিত হয়েছে কিন্তু প্রবাহ থেমে যায়নি। যায় নি এই কারণেই যে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি থিয়েটারকে বড় ভালোবেসেছেন – অন্যান্য যে কোন মাধ্যম থেকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন – পছন্দ করেছেন। থিয়েটার লোকশিক্ষার ও মনোরঞ্জনের বাহন হোক – এটা তাদের বরাবরের ইচ্ছে। তাই বাঙলা থিয়েটারে মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণির একটা বড়সড় ভূমিকা রয়েছে।

১৭৯৫ সন আজ থেকে ২১৮ বছর আগে রাশিয়ান গেরেসিম লেবেদফ যখন পন্ডিত শ্রী গোলকনাথ দাসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কলকাতার ডোমতলা লেনে (এখনকার এজরা স্ট্রীট) স্টেজ তৈরি করে The Disguise এর বাংলা অনুবাদ *'কাল্পনিক সংবদল'* দুবার মঞ্চস্থ করেন তখন একমাত্র ইংরেজরাই কলকাতায় মাঝে মধ্যে অভিনয় করতেন। লেবেদফ সাহেবের থিয়েটারের টিকিটের হার ছিল আট টাকা এবং চার টাকা - এবং তার দুই অভিনয়ই হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল। তখনকার দিনে আট টাকা বা চার টাকা দিয়ে টিকিট কেটে নাটক দেখার ক্ষমতা নিশ্চয়ই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছিল না। আমরা ধরেই নিতে পারি উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় বা ইংরেজরাই এর দর্শক ছিলেন। মানে তখনকার দিনে ইংরেজদের যে থিয়েটার ছিল - মানে যে থিয়েটারে তাঁরাই ছিলেন অভিনেতা/অভিনেত্রী দর্শক – সেই থিয়েটারের সঙ্গে কিছু সম্ভ্রান্ত ধনী বাঙালি যোগাযোগ রাখতেন -- প্রয়োজনে অর্থ সাহায্যও করতেন। তাঁরাই বোধ হয় এসেছিলেন।

যাই হোক, লেবেদফ নানাবিধ কাজে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেও বাংলা নাট্যভিনয়ের শুরুর রেশটা থেকে গেল। বেশ কয়েক বছর পর থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়, রাজা জমিদারগণ ইংরেজ থিয়েটারের অনুকরণে তাঁদের প্রাসাদ মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন করতে থাকেন এবং এরকম একজন ধনী ব্যক্তি চড়ক ডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়িতে ১৮৫৬ সনে প্রথম বাংলা নাটক রামনারায়ণ তর্করত্নের *'কুলীনকুলসর্বস্ব'* মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পর্যন্ত এই সব অভিনয়ের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি – ওঠা সম্ভবও ছিল না।তবু এই প্রাসাদ মঞ্চে মাইকেলের *'শর্মিষ্ঠা'*, *'পদ্মাবতী'*, নাটক *'একেই কি বলে সভ্যতা'* *'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'*র মতন প্রহসন কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের *'নবীন তপস্বিনী'* *'সধবার একাদশী'*, *'বিয়ে পাগলা বুড়ো'* বা রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক, *'চক্ষুদান'* প্রভৃতি অভিনীত হয়েছে এটাবড় কম কথা নয়।

১৮৭২ সনে ন্যাশানাল থিয়েটার নাম নিয়ে চিৎপুরের মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে যখন প্রথম দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পন'* নাটক সাধারণ মানুষের কাছে টিকিট বিক্রয় করে অভিনীত হোল তখন থেকেই বাংলা থিয়েটার একটা নির্দিষ্ট চেহারা পেল। থিয়েটারটি মঞ্চস্থ করলেন একেবারে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষজন, বাগবাজারের কিছু তরুণ। দর্শকের গরিষ্ঠাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষজন।

টিকিট ছিল তিন টাকা থেকে আট টাকা। এবং এরপর থেকেই জনসাধারণের চাহিদা, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমন্ডল থিয়েটারের ওপর ভীষণ ভাবে প্রভাব ফেললো কেননা জনসাধারণের মধ্যে টিকিট বিক্রয় করেই এ থিয়েটারকে চলতে হোত। থিয়েটার ক্রমেই জীবন্ত হয়ে উঠলো। দীনবন্ধু মিত্রের *'নীলদর্পণ'* নাটক দিয়ে যে সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা শুরু বোঝাই গেল কেবলমাত্র সামাজিক কুংস্কার মুক্তির প্রশ্নেই থিয়েটার থেমে থাকবে না, মধ্যবিত্তের প্রখর রাজনৈতিক বোধ থিয়েটারে প্রতিফলিত হবেই। পরাধীনতার জ্বালা, বিদেশি শাসকের পীড়ন, শোষণ ও ভন্ডামী তুলে ধরতে থিয়েটার উদ্যোগ নিল। নীলদর্পণের পথ ধরে যখন একে একে উপেন্দ্র দাসের *'শরৎ সরোজিনী' সুরেন্দ্র বিনোদিনী'* কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নাথের দেশপ্রেমমূলক নাটক *'পুরু বিক্রম' সরোজিনীর* মতো নাটক অভিনীত হতে থাকলো - বিদেশি ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেল। নাট্যমঞ্চের এই শাসক বিরোধী ভূমিকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে মাত্র চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৬ সনে ইংরেজ সরকার The Dramatic Performance Control Act 0f 1876 আইন পাশ করলেন। উদ্দেশ্য একটাই থিয়েটারের স্বাধীনতা খর্ব করা।

বিদেশি সরকারের এই বিধি-নিষেধ মধ্যবিত্তের থিয়েটারকেও একটু ভয় পাইয়ে দিল। থিয়েটার দিক বদল করলো - আশ্রয় করলো পুরাণ এবং ধর্মকে। এরই মধ্যে থিয়েটারে ঢুকে পড়েছিল ব্যবসায়ী মালিকানা - লাভ লোকসান। থিয়েটারের মালিকানা শাসক বিরোধী ভূমিকার চেয়ে লাভ লোকসানে উৎসাহী হয়ে উঠবেন এতে আর আশ্চর্য কি! উনিশ শতকের শেষ ভাগ ছিল হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানের মাহেন্দ্রক্ষণ ফলে সাধারণ দর্শক সমাজের মধ্যে ধর্ম ভাব প্রবল ছিল তাই ধর্মভাব সম্পন্ন পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে নাট্যশালা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতো কেননা গরিষ্ঠাংশ দর্শক তাতেই খুশি হতেন। অর্থাৎ দীনবন্ধুর যে সমাজ বাস্তবতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের যাত্রা শুরু সেই গতি রাখার চেয়ে গিরিশ চন্দ্রের নেতৃত্বে - সাধারণ রঙ্গালয় দর্শক নির্ভর হয়ে উঠলো বেশি করে। দর্শক রুচি পরিবর্ত্তন অপেক্ষা তোষণই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল - এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। *ধ্রুবচরিত, দক্ষযজ্ঞ, নলদময়ন্তী, চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* পরপর মঞ্চস্থ হওয়া তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

তবে অন্য আর একটি দিকও আছে। এই ব্যবসায়িক লাভ বা শাসকগোষ্ঠীর ভয় পুরোপুরি দর্শক সমাজ থিয়েটারের স্রষ্টাদের ওপর প্রভুত্ব করতেও পারেনি। দর্শক মানসিকতাকে সর্বদাই নিয়ন্ত্রণ করেছে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটেছে মঞ্চে। জাতীয় সংকটে দেশাত্মবোধের উন্মাদনা, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশীব্রত, বিলাতি বর্জন, স্বরাজ আন্দোলন সম্পর্কে কিংবা ইংরাজ শাসকের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদ-চেতনার প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে সচেতন জনমত গড়ে উঠলো থিয়েটার তার থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি। ব্যবসায়িক স্বার্থও বিবেচিত হোত – কেননা এই ধরনের নাটকে দর্শক সমাগম ছিল অভূতপূর্ব। তাই *প্রতাপাদিত্য, মীরকাশিম, সিরাজদ্দৌলা, বাজীরাও, ছত্রপতি শিবাজী, সৎনাম, তারাবাঈ* প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হোল এর মধ্যে বেশ কিছু নাটক রাজরোষেও পড়লো। পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক মূলক সামাজিক পটভূমিকার নাটক যেমন *সধবার একদশী, জামাই বারিক, প্রফুল্ল, বলিদান, শাস্তি* ইত্যাদিও দর্শক চেতনার কথা ভেবেই বাংলা থিয়েটারকে বারংবার মঞ্চস্থ করতে হয়েছে। তবে একথা এখানে বলতেই হবে নাটক সর্বদাই মঞ্চবশ ছিল। মঞ্চের প্রয়োজনেই তা রচিত হয়েছে - অভিনীত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অমরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনা বা পরিচালনায় – দর্শকের কথাটাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। মঞ্চ মায়া ও মঞ্চ কুহক সৃষ্টি ইত্যাদি দর্শক মনোরঞ্জনের স্বার্থে যতটা না হয়েছে – নাট্যের প্রয়োজনে ততটা নয়। তখনকার দিনে দর্শকের অবকাশ ছিল প্রচুর, বিলম্বিত লয়ে জীবন ছিল, তাই বহুক্ষণ ধরে নাটক দেখার আগ্রহও ছিল। তাই মূল নাটকের সঙ্গে পঞ্চরং প্রহসন বা গীতিনাট্য জুড়ে দেওয়া হোত। দর্শক বিচার বুদ্ধি দিয়ে নাট্য অনুধাবনের চেয়ে অভিনেতা/অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও চাতুর্য ও মঞ্চ মায়ায় আকৃষ্ট হতেন বেশি। যা এখনও বোধ হয় সত্য।

উনিশ শতকের শেষ কিংবা বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে পরিবর্তনের একটা আভাষ পাওয়া যায় - সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালির মনে আবহমানকালের সংস্কার সম্পর্কে একটা সংশয় দানা বেঁধে ওঠে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এর সঙ্গে সমাজনীতির একটা ব্যক্তি সংঘাত ঘটে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে সাধারণ রঙ্গালয়ে সুগভীর জ্ঞান ও প্রখর মননশীলতা নিয়ে শিশিরকুমারের আবির্ভাব এবং সাধারণ রঙ্গালয়ের অনিবার্য মোড় বদল ও দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়। সাধারণ রঙ্গালয় এই প্রথম একজন প্রয়োগ কর্তা পায় ফলে দর্শকদের চাহিদা ও রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতন অবস্থা নাট্যশালার তৈরি হয়। এর আগে অবশ্য ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্র প্রতিভার কল্যাণে অনন্য এক নাট্যধারার প্রবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু তার সমস্ত কিছুই উচ্চ চিন্তায় কথিত থাকায় বা সঠিক প্রচেষ্টার অভাবে কিছু শিক্ষিত ও মননশীল মানুষের মধ্যেই

আবদ্ধ থাকে ফলে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক আনন্দের পরিবেশক হয়ে থাকে একমাত্র সাধারণ রঙ্গালয়। সাধারণ রঙ্গালয়ে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে নব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এক নতুন সম্প্রদায় কাজ শুরু করলেন। যে বৈদগ্ধ্য ও রসবোধ নিয়ে শিশিরকুমার সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছিলেন তাতে তার অভিনয়ের তীক্ষ্ণ সচেতনতা ও আধুনিক প্রয়োগ কৌশল দর্শকদের মননশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সামাজিক নাটকে সূক্ষ্ম ও জটিল অন্তর্দ্বন্দময় মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া যেমন দর্শক গ্রহণযোগ্য হোল তেমনই রবীন্দ্রনাথের *বিসর্জন, তপতী, যোগাযোগ* প্রভৃতি নাটক মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণি গ্রহণ করার মতন মানসিকতায় উত্তীর্ণ হলেন। সংগে সংগে শরৎচন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তাও প্রতিফলিত হোল। মঞ্চ ও মঞ্চপ্রয়োগ সম্পর্কে দর্শক অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন এবং বাস্তবধর্মী অভিনয়ের ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। একদিন শিক্ষিত রুচিশীল মানুষরা শিশিরকুমারের নাট্য প্রযোজনার নিয়মিত দর্শক হয়ে উঠলেন। এবং তাদের কথা মাথায় রেখেই শিশিরকুমার *সীতার* মতন পৌরাণিক নাটক, *ষোড়শীর* মতন সামাজিক নাটক অথবা *দিগ্বিজয়ীর* মতন ঐতিহাসিক নাটকে সামগ্রিক অভিনয় ব্যতিরেকে প্রয়োগ কৌশলের দিকে গভীর নজর দিলেন। চারু রায় সৃষ্ট মঞ্চ স্থাপত্য, রবীন্দ্র সংগীতের ব্যবহার, হেমেন্দ্র কুমার রায় বা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে ভারতীয় নৃত্য শৈলীর সংগে দর্শকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটলো। পোশাক ও রূপসজ্জায় শিশিরকুমার ভারতের প্রাচীন পরিচ্ছদ পদ্ধতি মঞ্চে আনলেন। সাধারণ রঙ্গালয় ও তার দর্শক যথার্থ আধুনিক হয়ে উঠলেন।

এরপর চল্লিশ দশকে মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিজম-এর উগ্র প্রকাশ ঘটলো। যুদ্ধ ও মন্বন্তর এই দুই সংকটের সংঘাতে মধ্যবিত্তশ্রেণি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিভ্রান্ত ও পর্য্যুদস্ত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসী বিরোধী সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে গেল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বিপ্লবী সংস্কৃতি প্রচার আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক অংশ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মধ্যবিত্ত মানুষের এই রাজনৈতিক চেতনা মঞ্চে সমাজ বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি এবং নতুন সমাজের হৃৎপিন্ড দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠলো। দর্শকের মধ্যে এই বোধ প্রবল হয়ে উঠলো যে নাট্য হচ্ছে সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার। অথচ সাধারণ রঙ্গালয়ে ঐ সময় যে সব নাটক মঞ্চস্থ হোত তার মধ্যে সাধারণ মানুষ সে ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পেত না। মানুষ চাইছিল বাস্তবজগৎ ও রঙ্গজগতের মধ্যে ব্যবধানটা ঘুচিয়ে ফেলতে।

এই জ্বলন্ত সময়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে কমিউনিষ্ট পার্টির ছত্রচ্ছায়ায় ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা উদ্ভূত ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্য-এর *'নবান্ন'* সমাজ বাস্তবতা ও মননশীলতার এক নবজীবন দর্শন হয়ে উঠলো। আর এই নতুন সৃষ্টি, নতুন ভাবাদর্শ, শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য এর পরিচালনায় এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেনের সহযোগিতা ও অভিনয় সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে এমন এক নাট্য আন্দোলনের জন্ম দিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতো বটেই এই প্রথম কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণিও তাতে সামিল হলেন। থিয়েটারের দর্শকের ব্যাপ্তি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হোল। যে নতুন নাট্য আন্দোলনের জন্ম হল তার আদর্শ ছিল শ্রমজীবি মানুষের জীবন দর্শনের আদর্শ।

১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হোল। আমরা এর আগেও দেখেছি যখনই কোন ধাক্কা আসে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তা সহ্য করতে পারে না। গণনাট্য সংঘের অন্তর্ভুক্ত অনেকেই পার্টি ও সংঘের বাইরে গিয়ে অন্য পরিচয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন নাট্য দলের নাম দিয়ে কাজ শুরু করেন বা করতে বাধ্য হন। এছাড়া নাটকে শিল্প ও রাজনীতি কি পরিমাণে থাকবে সে জটিলতাও শিল্পীদের মধ্যে ছিল। কেননা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িত না থাকার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে - এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সহজসাধ্য ছিল না। স্বাধীনতার পরও ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের শ্রেণি চরিত্র ও তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কৌশল কি হবে সে বিষয়ে বামপন্থী মহলে অনৈক্যের সৃষ্টি হোল এ সবের ফলে গণনাট্য নামক বৃক্ষটি তার আদি স্বাস্থ্য ও চেহারা নিয়ে থাকতে পারলো না।

মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণি যেমন রাজনীতি ও সমাজনীতি বহির্ভূত শিল্পচর্চাকে মদত দিতে আগ্রহী নন তেমনই প্রচারসর্বস্ব রাজনীতিকে তারা থিয়েটারে দেখতে আগ্রহী নন। ফলে সমাজসচেতন একই সঙ্গে শিল্পসচেতন নাট্যধারাটি পরিস্ফুট হয়ে উঠলো বেশি করে। গণনাট্যের উত্তরাধিকার নিয়েই স্বাধীন যে নাট্য প্রবাহ নবনাট্য পরে গ্রুপ থিয়েটার নাম নিয়ে প্রকাশিত হোল তার প্রতি দর্শকের টান অনেক বেশি দেখা গেল। যে নাট্য প্রবাহের পুরোধা হিসেবে বহুরূপী এবং শম্ভু মিত্রের ভূমিকা সর্বাধিক। সেই পথ ধরে লিটল থিয়েটার গ্রুপ, শৌভনিক, রূপকার, নান্দীকার থেকে আজকের গণকৃষ্টি, স্বপ্নসন্ধানী পর্যন্ত অসংখ্য নাট্য দল সেই একই আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন জীবনবোধ, নতুন সমাজ প্রতিফলিত করার কাজে ব্রতী। আজ সাধারণ রঙ্গালয় তার উত্তরাধিকার বহন করে চলার মতন অবস্থায় নেই - তার ভার আছে - মান নেই তাই দর্শক কুলের সমস্ত আগ্রহই এই অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটারগুলিকে কেন্দ্র করে

গড়ে উঠেছে। বহুরূপীর যাত্রা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ এই থিয়েটার মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শকশ্রেণীকে আকৃষ্ট ও শিক্ষিত করে তুলেছে মৌলিক নাটক ব্যতীত, বিশ্ব নাট্য সমাজ, নাট্য সাহিত্য আহরণে, রবীন্দ্র নাট্যের সার্থক প্রয়োগে। ক্লাসিক নাটক ও বহুবিধ ভাবনা সম্বলিত আধুনিক নাটক সসম্মানে প্রযোজনা করেছে। পাশাপাশি গণনাট্য সংঘও তার সহযোগী শাখাগুলিকে নিয়ে কলকাতা ও মফস্‌সল বাংলায় তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন — নতুন নাট্যচেতনা ও নাট্যদর্শক গড়ে তোলার অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

সমাজজীবন রাজনীতি ও সমাজনীতি থেকে যেমন বিচ্ছন্ন থাকতে পারে না তেমন সেই সমাজকেও অবহেলা করতে পারে না নাট্যশালা। সমাজের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা, আনন্দ স্বপ্ন যদি নাটকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত না হয় তবে দর্শকের কাছে সে নাট্য বা নাট্যশালার কোন মূল্য থাকে না।

যুগ পালটায়, দর্শকের চাহিদাও পালটায় কিন্তু নাট্য ও নাট্যশালা জাতির চেতন অবচেতন মনে অধঃপতনের দুষ্ট ক্ষতগুলি সম্পর্কে সচেতন করুক, সংকট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করুক নাট্যশালার কাছে দর্শক এই বরাবর চেয়েছে। দর্শক চেয়েছে বক্তব্য সে প্রকাশ্যেই হোক আর প্রচ্ছন্নই হোক যেন হয় জীবনধর্মী ও সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ।

পরিশেষে একটাই কথা বলার, যে দর্শকের কথা বলা হোল তা একান্তই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণির দর্শক। খেটে খাওয়া মানুষ-কৃষক ও শ্রমিকদের কাছে আমাদের থিয়েটার এখনও পৌঁছয়নি যেমন পৌঁছয়নি থিয়েটারের শুরুর দিনে।

সৌঃ বিষয় থিয়েটার ২০০৩